অধ্যায় ৯

ভূ-প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত দুর্যোগ ও তার প্রতিকার

অধ্যায় ৯ ভূ-প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত দুর্যোগ ও তার প্রতিকার

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ ভূ-প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা বিষয়ক স্থানীয় লোককথা, প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস
- ☑ বাংলাদেশ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সংঘটিত বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- ☑ পরিবেশের সজীব ও অজীব উপাদানের উপর বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনাবলির প্রভাব

পৃথিবীর উপরের অংশ মহাসাগর এবং স্থলভাগ নিয়ে গঠিত, যাকে আমরা একত্রে ভূপৃষ্ঠ বলি। এই ভূপৃষ্ঠে নানা রকম ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে যা আমাদের মনে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, বন্যা ইত্যাদি হচ্ছে এরকম কিছু ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনা।

এই সকল ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনা যেসব প্রক্রিয়ার কারণে হয়, তার কিছু আসে ভূপৃষ্ঠের নিচে থেকে আর কিছু আসে ভূপৃষ্ঠের উপরের উৎস থেকে। যেমন অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, সুনামি ঘটে মূলত ভূ-অভ্যন্তর থেকে আগত শক্তির কারণে। ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডো ঘটে থাকে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলের শক্তির পরিবর্তনের কারণে। এসব দুর্যোগ যেমন প্রচুর পরিমাণে প্রাণহানি ঘটে, ঠিক একই সঙ্গে প্রচুর সম্পদ বিনষ্ট করে। তাই এসব দুর্যোগের কারণ জানা থাকলে প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন করে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

ভূ-প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা বিষয়ক স্থানীয় লোককথা, প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস

মানুষ যখন বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনার পিছনের কারণগুলো জানত না, তখন তারা এই ভুপ্রাকৃতিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য নানা ধরনের লোককাহিনি গড়ে তুলত। ভূমিকম্প যেহেতু কোনোরকম পূর্বাভাস না দিয়ে হঠাৎ করে আঘাত করত তাই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ভূমিকম্প নিয়ে নানা ধরনের লোক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন আমাদের দেশে অনেক জায়গায়তেই গল্প প্রচলিত আছে যে বিশাল পৃথিবীটি আসলে একটি অনেক বড় একটি ষাঁড়ের শিংয়ের উপর রাখা থাকে। এই পৃথিবীর ভার বহন করতে করতে ষাঁড়টি যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সেটি তার একটি শিংয়ের উপর থেকে সরিয়ে অন্য শিংয়ের উপর নিয়ে যায়। এক শিং থেকে অন্য শিংয়ের উপর স্থানান্তর করার সময় পৃথিবীটাকে একটি ঝাঁকুনির ভেতর দিয়ে যেতে হয় এবং তখন পৃথিবীর মানুষ ভূমিকম্প অনুভব করে।

বন্যা নিয়েও আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি লোক কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে পাহাড়ের উপরে থাকা গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দেওয়ার পরেও তারা একটি ড্রাগনকে কেটে খেয়ে ফেলেছিল এবং তার শাস্তি হিসেবে গভীর রাতে মাটি ফেটে পানি বের হয়ে পুরো এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায়।

কোনো কোনো এলাকায় অনাবৃষ্টির সময়য় আকাশ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে আনার জন্য ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। ২০২২ সালেও যখন পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় নি, তখন বাংলাদেশ এবং ভারতের কিছু জায়গায় অনেক ধুমধাম করে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়ছিল।

শিলা বৃষ্টিতে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়। সেজন্য এই এলাকায় একধরনের গুণিন পাওয়া যেত যারা মন্ত্র পড়ে আকাশে কালো মেঘ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নিয়ে যেতে পারে বলে জনশ্রুতি ছিল। তাদেরকে চাষিরা আমন্ত্রণ করে নিজেদের এলাকায় নিয়ে যেত এবং প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করতো বলে স্থানীয় মানুষেরা বিশ্বাস করত!

বাংলাদেশ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সংঘটিত বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক দুর্যোগ

অগ্নুৎপাত: বাংলাদেশে কোনো আগ্নেয়গিরির নেই। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে আন্দামান সাগরে ব্যারেন আইল্যান্ডে। এছাড়া জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে প্রচুর আগ্নেয়গিরি রয়েছে। মূলত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিমালাকে ঘিরে এসব আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে তা থেকে প্রচুর লাভা, গ্যাস, জলীয় বাষ্প, ছাই এবং পাথরের টুকরা নির্গত হয়। আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরক প্রকৃতির হলে তা থেকে নির্গত বস্তুসমূহ আগ্নেয়গিরি থেকে আশপাশের এলাকায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য সেই স্থান থেকে অন্য কোথাও সরে যাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ। একটি আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের আগে নানা রকম আভাস পাওয়া যায়। যেমন ঘন ঘন ভূমিকম্প, পাহাড়ের আকারের পরিবর্তন, পাহাড়ের গায়ে ফাটল দিয়ে ধোঁয়া ও গ্যাস বের হওয়া ইত্যাদি। এসব নিঁখুতভাবে পর্যবেক্ষণ করে ভূতত্ত্ববিদেরা অগ্নুৎপাতের পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য দ্রুত কোথাও স্থানান্তরসহ অন্যান্য পরিকল্পনা আগে থেকে করে রাখতে হয়। লাভা, গ্যাস ইত্যাদি যেহেতু পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নামে, তাই পাহাড়ের নিচের দিকের পথ বা নদী এড়িয়ে চলতে হবে। এছাড়া অগ্নুৎপাতের সময় বাড়ি ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে হবে। ছোট বাচ্চা এবং পোষা পশু বাড়ির ভেতরে রাখতে হবে।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নেপালের একটি শহর

ভূমিকম্প: টেকটনিক প্লেটের স্থানান্তরের জন্য প্লেটের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তা ভূমিকম্প আকারে মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসে। গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে প্রায় সারা বছরই বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এর মধ্যে কিছু কিছু ভূমিকম্প প্রবল মাত্রার যা মানুষের জীবন এবং সম্পত্তির ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশের আশপাশে এবং ভিতরেও বেশকিছু ফল্ট লাইন থাকায় বিভিন্ন জেলার মানুষ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।

ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, ভূপৃষ্ঠ ঝাঁকুনির ফলে রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো স্থানে ভূমিতে ফাটল দেখা দিতে পারে। ভূমিকম্পের সময় কোনো স্থানে বাড়ির ভিত্তির নিচের মাটিতে পানির পরিমাণ বেড়ে যাবার ফলে তা নরম হয়ে ভবন মাটির মধ্যে দেবে যেতে পারে। পাহাড়ি এলাকাগুলোতে পাহাড় ধস হতে পারে। এক্ষেত্রে পাহাড়ের কোনো পাশের মাটি বা

পাথর যদি আলগা থাকে তবে তা ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে নিচের দিকে প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসে। সাগর বা মহাসাগরের তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে সুনামি নামক ভয়াবহ ঢেউয়ের সৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন ১৭৬২ সালের আরাকান অঞ্চলের ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভূমিকম্পের কারণ, পরিমাপ ও ভূমিকম্পের সময় নিরাপত্তার জন্য কী করা প্রয়োজন সেটি একাদশ অধ্যায়ে তোমাদের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুনামি: গভীর সমুদ্র বা মহাসাগরের তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে সেই এলাকার পানিতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আলোড়ন বা ঢেউ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে শত শত কিংবা কয়েক হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রসৈকতে আছড়ে পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ঢেউ কয়েক মিটার উচ্চতার হয়ে থাকে এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গতিবেগে ধেয়ে আসতে পারে। এই প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে সুনামি সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে। ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কারণে যে সুনামি সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণে বিভিন্ন দেশের ২,৪০,০০০ এরও অধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। শুধু ইন্দোনেশিয়াতেই ১,৬৫,০০০ এর অধিক মানুষ মারা গিয়েছিল। ২০১১ সালের আরেকটি সুনামির কারণে জাপানের ফুকুশিমায় অবস্থিত একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০০৪ সালের সুনামি পরবর্তী ধ্বংসস্তূপ

সুনামি এত দ্রুত ঘটে যে প্রস্তুতির জন্য খুব কম সময় পাওয়া যায়। সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। এ ক্ষেত্রে রেডিও টেলিভিশন কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত সতর্কতা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সুনামির সতর্কতা পাওয়া মাত্র যত দ্রুত সম্ভব সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত। এ ছাড়া যদি দূরে যাওয়ার সুযোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে উঁচু স্থান বা ভবনে আশ্রয় নেয়া উচিত।

ঘূর্ণিঝড়: ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বাংলাদেশের প্রতিবছরই হয়ে থাকে। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড় হয় এবং এলাকাভেদে সেগুলোর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম সাইক্লোন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দিকে অবস্থিত আটলান্টিক মহাসাগরে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড় কে হারিকেন বলা হয়। চীনের পূর্ব উপকূলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে সেখানে টাইফুন বলে। নাম যাই হোক এগুলো সবই ঘূর্ণিঝড় যা কয়েক দিন ধরে চলতে পারে এবং অনেক বড় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় বায়ুমণ্ডলের চাপের তারতম্যের কারণে সৃষ্টি হতে পারে। তবে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় সাগরে এবং তা ক্রমাগত স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে সমুদ্রের উপরোক্ত পানির তাপমাত্রা অন্তত ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হয়। একটি পর্যায়ে বৃষ্টিপাতের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের বায়ুর শক্তি হ্রাস পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্যাটালাইট থেকে তোলা ঘূর্ণিঝড়ের ছবি

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূলীয় এলাকার ঘরবাড়ি এবং কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বনের গাছপালা ধ্বংস এবং পশু-পাখির মৃত্যুর ফলে বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যত ঘূর্ণিঝড় হয়েছে তার মধ্যে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ফলে স্মরণকালের সর্বোচ্চ প্রাণহানি ঘটেছিল।

ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সময়কালে কিছু পূর্বপ্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন। যেমন ঘূর্ণিঝড়ের সময় যেন দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সরে যাওয়া যায় সেই প্রস্তুতি রাখা। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ের জন্য শুকনা খাবার, বোতলে বিশুদ্ধ পানি, কিছু অর্থ, ওষুধ ইত্যাদি ঘরের মেঝে বা মাটির নিচে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন ঘূর্ণিঝড় শেষ হলে ত্রাণ না আসা পর্যন্ত সেগুলো দিয়ে কয়েক দিন চলা যায়।

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস

জলোচ্ছ্বাস: উপকূলীয় এলাকার মানুষ জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে পরিচিত। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া আরেকটি বিপর্যয় হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস। জলোচ্ছ্বাসের সময় সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউয়ের তুলনায় অনেক উঁচু ঢেউ সৃষ্টি হয়। সে ক্ষেত্রে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথি থাকলে জলোচ্ছ্বাস আরও উঁচু ঢেউ সৃষ্টি করে। আবার ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ যত বেশি হবে জলোচ্ছ্বাসের ঢেউয়ের উচ্চতা তত বেশি হবে।

জলোচ্ছ্বাস এর ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের মতো একই পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হয়।

টর্নেডো

টর্নেডো: বায়ুমণ্ডলের অপর একটি ঝড় হচ্ছে টর্নেডো। তবে সাইক্লোনের সঙ্গে টর্নেডোর পার্থক্য হচ্ছে এর সৃষ্টির স্থান এবং স্থায়িত্ব। টর্নেডো সৃষ্টি হয় স্থলভাগের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ার ফলে। এ ক্ষেত্রে উক্ত স্থানের বায়ু গরম ও হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং বায়ুচাপ অতিরিক্ত কমে যায়। তখন তার আশপাশের এলাকা থেকে ঠান্ডা এবং ভারী বাতাস প্রচণ্ড বেগে নিম্নচাপের দিকে ধেয়ে আসে। ফলে সেখানে ২৫০-৩০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় গতিবেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। টর্নেডোর স্থায়িত্ব সাইক্লোনের তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে। সাইক্লোন যেখানে তিন চার দিন ধরে চলে, সে ক্ষেত্রে টর্নেডোর স্থায়িত্ব মাত্র ২ থেকে ৩ মিনিট। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে টর্নেডো ক্ষুদ্র এলাকাতে ব্যাপক ধ্বংস বয়ে আনতে পারে। সাইক্লোনের ক্ষেত্রে যেভাবে আগে পূর্বাভাস পাওয়া যায়, টর্নেডোর ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ নেই।

টর্নেডো থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, আশপাশে কোনো মজবুত ভবন থাকলে তাতে আশ্রয় নেয়া। এ জন্য বিভিন্ন দেশে মানুষ টর্নেডোপ্রবণ এলাকায় মাটির নিচে ঘর করে নিজস্ব টর্নেডো আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করে থাকে।

বন্যায় আশ্রয়ের জন্য যাচ্ছে ছোট শিশু

বন্যা: বন্যা বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত ঘটনা। বন্যা বলতে পানির অতিরিক্ত প্রবাহকে বোঝায়, যা সাধারণত শুষ্ক স্থানকে প্লাবিত করে। বিভিন্ন কারণে বন্যা হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে অতিবৃষ্টি, নদীর নাব্যতা হ্রাস (অর্থাৎ নদী কতখানি পানি বহন করতে পারে তার ক্ষমতা কমে যাওয়া), জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। বন্যা বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। যেমন পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি ঢলের সৃষ্টি হয় যা খুব দ্রুত কোনো স্থান প্লাবিত করতে পারে। এই ধরনের বন্যা যেমন দ্রুত ঘটে, ঠিক তেমনই দ্রুত পানি নেমে যায়। আবার দেশের অন্যান্য এলাকায় বন্যার পানি আস্তে আস্তে বাড়তে

থাকে, কয়েকদিন ধরে আটকে থাকে এবং ধীরে ধীরে পানি কমতে থাকে। উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এবং প্রবল বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে বন্যা হতে পারে। শহরাঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বৃষ্টির সময় পানি বের হয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারণে মানুষের নানাভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। সাঁতার না জানা অনেকে বন্যার সময় পানিতে ডুবে মারা যায়। বন্যার পানিতে সহায়-সম্পত্তির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ছাড়া খাদ্যের অভাব এবং বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগেও মানুষ আক্রান্ত হয়।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পূর্বপ্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। যেমন-

- বাড়ির ভিটা স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে বেশি উঁচু করে নির্মাণ করতে হবে যাতে বন্যার পানি ঘরে না ওঠে।
- টিউবওয়েল উঁচু স্থানে স্থাপন করতে হবে যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায়।
- গবাদিপশু মূল্যবান সম্পদ। এ জন্য এগুলো রক্ষার জন্য আগে থেকে উঁচু জায়গা কিংবা দূরবর্তী শুকনা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্যার মাস শুরুর আগে শুকনা খাবার, ফসলের বীজসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুদ রাখতে হবে।
- সাপের কামড় থেকে বাঁচতে নিয়মিত বাড়িঘর এবং আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখতে হবে। পারতপক্ষে রাতের বেলা অন্ধকারে চলাচল থেকে বিরত থাকতে হবে। কার্বলিক অ্যাসিড রাখলে সাপের উপদ্রব কম হয়।
- ছোট শিশুদের সাঁতার শেখাতে হবে।

পরিবেশের সজীব ও অজীব উপাদানের উপর বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনাবলির প্রভাব

আমরা এই অধ্যায়ে যে সকল ভৌগোলিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে জানলাম, সেগুলো পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলে। যেমন অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা লাভা এবং পরবর্তী সময়ে ছাই দিয়ে ঢেকে যায়। ফলে সেখানকার মাটির উপরে আগ্নেয় শিলার স্তর পড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মাটির উর্বরতাশক্তি পরিবর্তিত হয়ে যায়, যার ফলে সেখানে নতুন ধরনের উদ্ভিদ কিংবা ফসল জন্মায়। লাভার গতিপথে নদী থাকলে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আবার আগ্নেয়গিরির সঙ্গে যেসব বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে আসে, তা মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য ক্ষতিকর। প্রচণ্ড উত্তাপে আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি বন থাকলে তাতে আগুন লেগে যেতে পারে।

ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধস হয়, এমনকি নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায় যা বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের সময় কোনো স্থানের মাটি উঁচু হয়ে পাহাড়-টিলা গঠন করতে পারে। আবার অনেক স্থানে মাটি ফেটে গিয়ে অথবা নিচের দিকে দেবে গিয়ে জলাভূমিও তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া উল্লিখিত সকল ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদ এবং প্রাণহানি ঘটে।

অনুশীলনী ?

১। বাংলাদেশে প্রতি বছর অক্টোবর নভেম্বর-মাসে এবং এপ্রিল-মে মাসে ঘূর্ণিঝড়ের প্রাদুর্ভাব হয় কেন?